ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1032-1042
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.320

বাদল সরকারের নাট্যসংলাপ ও কাব্যিক প্রকাশ

সাহেব দাঁ, *গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 09.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Dialogue is one of the six essential elements of drama, often considered its very soul. It is through dialogue that a playwright's deepest hopes, desires, and emotions are channeled. A successful playwright employs dialogue with utmost precision, yet the style of usage varies across different eras and authors. In this context, Badal Sircar and his works hold a significant place. Emerging in the second half of the twentieth century, Sircar was not just a playwright, but also a director, actor, and producer. Through constant experimentation, he strove to offer something new to Bengali theatre, introducing the concepts of the Absurd and Third Theatre. His visionary approach added a distinct dimension to the landscape of Bengali drama.

Much like Mohit Chattopadhyay, Badal Sircar was initially drawn to poetry. While working as a town planner, he spent his leisure time writing numerous short poems for himself or in letters to his beloved wife. These were later published in a collection titled 'Nanamukh' (Anjali Basu, November 1988). Eventually, he felt that poetry alone could not fully express his inner self. Consequently, he moved toward playwriting, aiming to present himself more comprehensively to society. However, since poetry was his first love, its influence naturally persisted in his plays. In works like 'Evam Indrajit' (1963), 'Sara Rattir' (1963), 'Jodi Ar Ekbar' (1966), and 'Circus' (1969), poetic verses and sensibilities frequently surface in the characters' dialogues. In these four selected plays, characters turn to poetry for various reasons: sometimes to escape the monotony of life, sometimes to survive on false hope amidst loneliness, or perhaps seeking peace from the dissatisfactions of the present and future. In some instances, they bid a final farewell to poetry through the lens of shattered faith and extreme despair. Thus, by creating diverse situations and weaving poetic dialogues into his characters' voices, Badal Sircar showcased his masterful skill in dialogue construction and highlighted his profound poetic identity.

Keywords: Nandimukh, Prabaser Hijibiji, and Ebong Indrajit— monotony, Sararatir— loneliness, Jodi Ar Ekbar — unfulfillment, Circus— despair.

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নাট্যসাহিত্যে বাঁক বদলকারী ব্যক্তিত্ব হলেন বাদল সরকার (১৯২৫-২০১১ খ্রি.)। ডাক নাম সুধীন্দ্র সরকার। তিনি ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ছেলেবেলায় পড়াশোনার পাশাপাশি দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষিরোদপ্রসাদ, গিরিশচন্দ্রের নাটক পড়ে শেষ করেছেন। বড়ো হয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করে দেশ থেকে বিদেশ পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরেছেন। সেই সুবাদে শেকসপিয়র, সেরিডান, মলিয়ের, বার্নাড শ' প্রমুখের

নাটক পড়েন এবং থিয়েটারে তার অভিনয়ও দেখেন। এইভাবে ধীরে ধীরে নাটকের প্রতি বাদল সরকারের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। একজন টাউন প্ল্যানার হয়ে দিনে চাকরি করার পরেও অবসর সময়ে একের পর এক নাটক রচনায় হাত দেন। শুধু নাটক রচনাই নয়; পাশাপাশি অভিনয়, নির্দেশক, প্রযোজক হয়েও সমানভাবে খ্যাতি অর্জন করেন। যা জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত বহমান থেকেছে। মূলত তাঁর নাট্যকর্মকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা— প্রসেনিয়াম থিয়েটার এবং থার্ড থিয়েটার। এই দুই পর্বে রচিত নাটকগুলিতে নাট্যকার প্রথম দিকে সিচ্যুয়েশনাল কমেডি দিয়ে শুরু করলেও পরে পরে চক্রাকারে বয়ে চলা জীবনের গভীর অর্থের অনুসন্ধান করেন। অর্থাৎ সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে নাটকের বিষয়কে গুরুগম্ভীর করে তুলেছেন।

একটি নাটকে মোট ছয়টি উপাদান থাকে। তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হলো সংলাপ। বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে বলেছেন, "সংলাপঃ স্যাদ্ গভীরোক্তির্নানাভাব সমাশ্রয়ঃ"[১] অর্থাৎ নানাভাবের ব্যঞ্জনাপূর্ণ গভীরোক্তিই হলো সংলাপ। দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "বস্তুত বৃত্ত ও চরিত্র নাটকের অপরিহার্য উপাদান হলেও সংলাপবর্জিত নাটক অর্থহীন।"[২] এই বক্তব্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, নাটককে গতিশীল, পরিণামমুখী, চরিত্রকে প্রাণবন্ত, তাদের ভারসাম্য রক্ষা ইত্যাদি কার্যগুলি সুচারুভাবে চালনা করার জন্যই সংলাপের প্রয়োজন। এজন্য সংলাপকে সর্বদা হতে হবে সংক্ষিপ্ত, আবেগদীপ্ত, স্বাভাবিক, যথোপযুক্ত, প্রাণময়, গতিগর্ভ ইত্যাদি। একজন নাট্যকার তাঁর নাটকে উক্ত বিষয়গুলিকে মাথায় রেখেই তিনি নাটক রচনা করবেন। এতে নাটকটির মান যেমন উৎকৃষ্ট হবে, তেমনি নাট্যকারের সাফল্য আর দর্শকরাও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবে।

বাদল সরকার স্কুলে পড়াকালীন কয়েকটি ছোটো ছোটো নাটক ('স্লিপার্স অব সিণ্ডারেলা', 'পলাশীর যুদ্ধ' ইত্যাদি) রচনার চেষ্টা করেন। কিন্তু এগুলি প্রকাশ পায়নি। পরে অর্থাৎ ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি ইংরেজি চলচ্চিত্রের অভিনয় দেখে তার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শুধুমাত্র চরিত্রগুলিকে নিয়ে 'সলিউশন এক্স' নামক নাটকটি রচনা করেন। নাটকটিতে আগাগোড়া কমেডির ছড়াছড়ি। কমেডি ছাড়াও সহজ-সরল-স্বাভাবিক ভাষা, ছোটো ছোটো সংলাপ লক্ষ করা যায়। এতে দর্শক এবং পাঠক বাদল সরকারের নামে বেশ জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে দেয়। একইভাবে 'বড়ো পিসীমা' (১৯৫৯ খ্রি.), 'রাম শ্যাম যদু' (১৯৬১ খ্রি.) নাটকগুলি রচনা করেন। কিন্তু 'সমাবৃত্ত' থেকে তার গতানুগতিক ধারা পরিবর্তন করার প্রয়াস করেন, যা 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৯৬৩ খ্রি.) নাটকে গিয়ে পূর্ণতা মেলে। তাই 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকটিকে বাদল সরকারের নাট্যরচনার ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে ধরা হয়। নাটকটি রচনার জন্যই তিনি সমগ্র বাঙালি তথা ভারতবর্ষ থেকে বিদেশ পর্যন্ত সকলের কাছে নাট্যকার বাদল সরকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর এই জনপ্রিয় নাটকের বিশেষত্ব হলো চরিত্রদের মধ্যে অসামঞ্জস্য, উদ্ভট সংলাপ উচ্চারণ, সংলাপে উক্তি-প্রত্যুক্তির গরমিল এবং কাব্যিক সংলাপের প্রকাশ।

বাদল সরকারের জীবনে প্রথম ভালোলাগার জায়গা ছিল কবিতা। নিজের প্রিয়তমা পত্নীকে লেখা চিঠিতে কিংবা মনের অনুভবের ভাষাকে বহির্বিশ্বে প্রকাশ করতে কবিতাকারে ছোটো ছোটো চিরকুটে পাতার পর পাতা লিখে গেছেন তিনি। যা পরবর্তীকালে 'নান্দীমুখ' (অঞ্জলি বসু, নভেম্বর ১৯৮৮ খ্রি.) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। যদিও এই গ্রন্থ পাঠকসমাজে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। এছাড়াও, চিঠি ও ডায়রীর আকারে লেখা তাঁর আত্মজীবনী 'প্রবাসের হিজিবিজি'-তে কবিতার উল্লেখ রয়েছে। হঠাৎ করে কোনো এক সময়ে এসে তিনি উপলব্ধি করলেন, কবিতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে কোথাও যেন একটা সংকোচবোধ হচ্ছে। এই দ্বিধা কাটানোর জন্যেই নাটক রচনায় হাত দেন। কিন্তু কবিতাকে দূরে সরালেও তাঁর কবিস্বভাব মন শরীরের শিরা-উপশিরার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রয়েছে। অর্থাৎ নাট্যসত্তার সঙ্গে কবিসত্তা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত রয়েছে বলা যায়।

বাদল সরকারের নাটকে নাট্যকারের কবিপ্রতিভা কীভাবে ফুটে উঠেছে, তা আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের প্রথমেই 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের নাম উল্লেখ করতে হয়। প্রবাসকালে লেখা নাটকটির মধ্য দিয়ে নাট্যকার জীবনের একঘেয়েমি এবং অস্তিত্ববাদের উজ্জ্বল উপস্থিতির কথা তুলে ধরেছেন। এই একঘেয়েমি এবং অস্তিত্ববাদকে কাব্যিক সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। এর পূর্বাভাস নাটকটির মুখবন্ধে নাট্যকার জানিয়েছেন, "নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৩, কিন্তু আসলে কবিতায় আর ডায়েরীতে এটি রচিত হয়ে গিয়েছিলো লন্ডনে ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সালে। বস্তুত একটা ছাড়া সবকটি কবিতাই ঐ সময়ে লেখা।"[৩] এই মুখবন্ধ থেকে পাঠক হিসেবে আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি যে, নাটকটির পরতে পরতে রয়েছে কবিতা দিয়ে মোড়া।

"এক—দুই—তিন
এক—দুই—তিন—দুই—এক—দুই—তিন
চার—পাঁচ—ছয়
চার—পাঁচ—ছয়—পাঁচ—চার—পাঁচ—ছয়
সাত—আট—নয়
সাত—আট—নয়—আট—সাত—আট—নয়"[৪]

নাটকে লেখক চরিত্রের এই কবিতা আবৃত্তি আমাদের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। কিন্তু মনুষ্যজীবন যে নিরন্তর একটা চক্রের মধ্য দিয়ে আবর্তন করছে, তার নিদারুণ ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন নাট্যকার। এরপর নাটকের কাহিনি এগোলেই স্পষ্ট হয়ে আসে কবিতাটি।

"লেখক: এক—দুই—তিন। অমল—বিমল—কমল। —এবং ইন্দ্রজিৎ। এবং মানসী। ঘর থেকে স্কুল। স্কুল থেকে কলেজ। কলেজ থেকে দুনিয়া। বড়ো হচ্ছে। আর ঘুরছে। ঘুরছে আর ঘুরছে আর ঘুরছে। এক—দুই—তিন—দুই—এক। অমল—বিমল—কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ।"[৫]

মানব জীবনের এই চক্রাকার আবর্তন থেকে মুক্তির যে পথ রয়েছে তাই নাট্যকার নিরন্তর খুঁজে চলেছেন।

"লেখক: ইন্দ্রজিৎ ও মানসী। ঘুরতে ঘুরতে ওরা অনেক দূর চলে এসেছে। অনেক দূর? চলে এসেছে? না ঘুরছে? শুধু ঘুরছে? ওরা বিয়ে করতে পারে। তারপর? ঘুরবে। ওদের বিয়ে নাও হতে পারে। তাহলে? ঘুরবে.....
দিকে দিকে থাক ঐতিহাসিক পাথুরে নয়ন মেলা,
ছন্দবাঁধনে আবর্তনের চলুক অনাদি খেলা,
আলো আঁধারির চক্র ধাঁধায় কালের শোণিতধ্বনি
দিবারাত্রের খণ্ডচয়ণে গেঁথে যাক বন্ধনী,
অজানা দিশায় আগামী অতীত ভুলে যাক সন্ধান,
আমি তো বর্তমান।
কী হবে মিথ্যা সূক্ষ্ম হিসাবে পুরোনো সংখ্যা গুণে?
কী হবে স্বপ্নে ভবিষ্যতের তন্তু-আঁচল বুনে?
রাত্রিদিনের ছন্দে কখনো যাবে না তো কেটে তাল,
বৃথা কেন তবে মনের দেউলে ভরে তোলা জঞ্জাল?
হৃৎস্পন্দন সময়ের তালে বেঁধে নিতে যদি পারো
পরোয়া থাকে না কারো।

.....এক মুহূর্ত—আবর্তনকে অস্বীকার করো। পুরো অঙ্কটা অস্বীকার করো।.....
নির্বোধ মনে অবুঝ অঙ্কে তবু উত্তর খোঁজা,
তবু সংখ্যার চক্ররাশিতে ভারি করে তোলা বোঝা।
অনেক দিনের হিসাবে শূন্য—সে কথা জায় না মানা,
অল্পদিনের ক্ষুদ্র গণনে তাই তো গণ্ডী টানা।
প্রকৃতিপত্রে শিশু অক্ষরে জীবনের ভাষা তাই
এখনো তো লিখে যাই।"[৬]

এই আবর্তনের অঙ্ক ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে চলেছে। কথাগুলি যেন হয়ে উঠেছে নাটকের মর্মবাণী।

"নাগরদোলার আবর্ত-ছাঁদে গড়া
আমি এলোমেলো আকাশে এনেছি নেশা
অজ্ঞ বাতাস চেতনার বিষে মেশা,
না জানা ছন্দে ভাঙাচোরা বোঝাপড়া!
এদের কথা আমাকে বলতে হবে! এদের নাটক আমাকে ভাষায় গাঁথতে হবে!
ভাষা তো প্রাচীন, ক্ষতবিক্ষত কথা,
আলো দিশাহারা শিথিল অপ্রকাশে,
সমাধি মৌন জড়তার নাগপাশে,
চিতাবহ্নিতে প্রদীপ্ত বাচালতা।"[৭]

এই মর্মবাণীতে বোঝা যায় আবর্তনের পথিক চরিত্রটি লেখকরূপে নাট্যকার নিজেই। এই সংলাপ কবিতা থেকে কাব্যভাষার রূপ নিয়েছে।

"ঘন্টা বাজছে। একটি পরমাণু খসে গেছে। আরেকটি পরমাণুকে ডাকছে। তিনটি পরমাণু ডাকছে। আরো রাশি রাশি পরমাণু মিলে মিশে তালগোল পাকিয়ে বিরাট এক পৃথিবী ঘুরছে আর ঘুরছে। আর একের পর এক সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে।..."[৮]

এই আবর্তনের মধ্যেই নাট্যকার অস্তিত্ববাদের ইঙ্গিত টেনে বলেছেন,

"আমি বিভক্ত, আমি অণুখণ্ডিত,
গুঁড়ো দিয়ে গাঁথা জটিল ঐক্যতান।
বুড়ো শতাব্দী আজো পেতে আছে কান,
চূর্ণ পৃথিবী এখনো অপরাজিত!"[৯]

মানবজীবনের আবর্তনের অঙ্কের হিসাব-নিকাশ করতে গিয়ে নাট্যকার একসময় বিরক্তি বোধ করেন। তাই নাট্যমঞ্চে অমল, বিমল, কমলের অনুপস্থিতিতে লেখক নিজের ভাবনা নিয়ে বসে থাকাকে অর্থহীন মনে করেছেন।

"আমি। বসে ভাবি। শুধু ভাবি।
শুধু ভাবি বসে আমি খণ্ডিত উপকথা,
অসম্ভাব্য বায়বীয় পূর্ণতা।
সমাপ্তি যদি মেশে বিলোপের গানে,
অর্ধচেতনা তবু কেন আনে
ঝংকৃত মুখরতা?

.....
জীবনের বীজ ধুলোতে কি মিশে আছে?
কী হবে কুড়িয়ে ছাঁকা ভবিষ্যকণা?
.....
বৃথা পরিকল্পনা।
আমি। বসে ভাবি। আজো ভাবি।
আজো কেন তবু ভাবি পুরো মানুষের কথা?
অংশ-চেতনা আজো কেন খোঁজে লিখনের অন্যথা?"[১০]

দীর্ঘ সময় ধরে মাসিমা লেখকের জন্য খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে। লেখকের অর্থহীন ভাবনায় মাসিমা যোগদান করলে তার উদ্ভট কথাবার্তা শুনে তাকে বিয়ে করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু লেখক গতানুগতিক জীবনের পথে হাঁটতে রাজি নয়। তাই মাসিমা অন্য সকলের বিয়ের কথা বললে লেখক তার প্রতিবাদ করে জানায়,

"এই পেয়ে গেছি! সব্বাই করছে।
কেন তুমি হাঁচবে? কেন তুমি কাশবে?
দাঁত ক'টি মেলে ধরে কেন মধু হাসবে?
কেন তুমি দেবে তুড়ি, ওরা যদি তুলে হাই?
সব্বাই করে বলে, সব্বাই করে তাই!"[১১]

"কাব্যির নাম শুনে কেন তুমি পালাবে?
কেন রোজ রেডিওটা অতো জোরে চালাবে?
কেন তুমি ডালে দেবে আটখানা লঙ্কাই?
সব্বাই করে বলে সব্বাই করে তাই!"[১২]

আলোচ্য দু'টি কবিতার মধ্যে নাট্যকার বুঝিয়েছেন, অন্য সকলের মতো বিয়ে করে সাংসারিক জীবন পালন করা মানে চক্রাকারে জীবনকে ঘোরানো। এই লজিক অগ্রাহ্য করেন বলেই তিনি অন্যদের থেকে পৃথক। এইভাবে নাটকটিতে মাঝে মাঝে কাব্যিক সংলাপ দিয়ে সুন্দর চলতে থাকে। চরিত্রদের অর্থহীন জীবনে অর্থবহ কাব্যিক সংলাপ দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। পরের কবিতায় শোনা যায় তাদের অন্তরের মর্মবাণী। প্রায়ান্ধকার মঞ্চে আলো-আঁধারির পরিবেশে তাদের গম্ভীর কণ্ঠস্বর আবৃত্তি করে ওঠে—

"মৃত্তিকা সমুদ্রে শেষ। সমুদ্র দিগন্তে সীমাটানা।
সৌরমণ্ডলের চক্রে পৃথিবীর নগণ্য ঠিকানা
কোথায় হারিয়ে আছে।
অবিশ্রান্ত সময়ের কাছে
.....
ধরণীর অর্থহীন প্রাণ।
.....
অবশ্য মৃত্যুর ছন্দে খুঁজে ফেরা তালের বিচ্যুতি,
.....
এখনো লেখেনি মর্তে মানুষের স্বল্প ইতিহাস।"[১৩]

এরপর মানসী জানায়,

"তবু আমি কীটাণু-অধম
বেশরম।
প্রতিবেশী সান্ত্বনায় ভুলে থাকি বিরাট ধারণা
জটিল গণিত-তত্ত্ব সূক্ষ্ম আলোচনা।...."[১৪]

এইভাবে নাটক শেষের দিকে ক্রমশ এগোতে থাকে। অস্তিত্ববাদের বিষয়টি আরও জোরালো হয়ে দাঁড়ায়। ইন্দ্রজিৎ এবং মানসী শেষবারের মতো দেখা করবে তাদের ওই পুরোনো মাঠের ঝাঁকড়া-মাথা গাছের নিচে।

"ও মাঠে মাটিতে ঘাসে মেশা
অনেক পুরোনো নেশা
অনেক জরুরি আলোচনা,
.....
আজে বাজে দু'টো কথা রাখি,
দু'দণ্ড বসে থাকি
কাছাকাছি গোলাপী বাতাসে।"[১৫]

ইন্দ্রজিৎ নিজের অস্তিত্বের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। এতদিন ধরে যার কাছে সবকিছুর উত্তর ছিল, আজ সে যুক্তি–তর্ক–বিচারের ধার ধারে না। ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ঘুমোতে চায়। এই অর্থহীন মানুষের ক্লান্তিময় জীবনের কথা লেখক তুলে ধরে কবিতার লাইন জুড়ে।

"আমি ক্লান্ত। বৃথা প্রশ্ন থাক,
এখন ঘুমোতে দাও নিভন্ত নির্বাক
ছায়ার গভীরে।
কী হবে কথার রাশি দিয়ে?
কী হবে তর্কের বীজ বাতাসে ছড়িয়ে?
আমি ক্লান্ত যুক্তির জ্বালায়,
আমাকে ঘুমোতে দাও একা নিরালায়
ছায়ার গভীরে।...."[১৬]

ইন্দ্রজিতের ক্লান্তিময় একঘেয়ে জীবনে আরও এক মানসী আসে। তাকে স্বপ্ন দেখায়। জীবনের প্রতি বিশ্বাস রাখতে বলে। এই স্বপ্ন একদিন ফুরিয়ে গেলেই শক্ত জমি মিলবে। আসল জীবন শুরু হবে। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস রাখতে না পেরে বলে,

"ভেসে থাকি আস্তিকের দৈন্য নিয়ে,
কুটোয় এলিয়ে রাখি জীবনের ভার,
মুছে গেছে অন্য পার কুয়াশার সাদা দীর্ঘশ্বাসে।
.....
জোলো সান্ত্বনার বুলি ছেড়ে দাও,
কেড়ে নাও বিশ্বাসের অন্ধ ঠুলী,
.....
ডুবো পাথরের ভিতে পাতালে সে পাতে রাজধানী।"[১৭]

মানসীর সংলাপ আমাদের মুক্তির কথা বললেও ইন্দ্রজিৎ কখনও তা মেনে নেয়নি। মানবজীবন অভিশপ্ত সিসিফাসের প্রেতাত্মার মতো। জীবনে বেঁচে থাকার জন্যে প্রথম দিন থেকে নিরর্থকভাবে শুধু ঠেলেই যেতে হয়। এই ঠেলার না আছে কোনো বর্তমান আর না আছে কোনো ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ জীবনের তীর্থযাত্রায় কোনো তীর্থ নেই; আছে শুধুমাত্র যাত্রা। এই যাত্রাপথ ধরেই লেখক তার উদাত্ত কণ্ঠস্বরে নাটকের শেষে ঘোষণা করে—

"আজো তাই
এ পথের শেষ নাহি পাই।
ফুরালে এ পথ
পূর্ণ হবে সর্ব মনোরথ
.....
এ যাত্রায় তাই
উদ্দেশ হারালো আজ, অর্থ কিছু নাই।
.....
দিবসান্তে আজ যেন মন
নাহি ভোলে সেই দীক্ষা। তীর্থ নয়,
তীর্থপথ আমাদের—মনে যেন রয়।"[১৮]

সমগ্র নাটকটি অস্তিত্ববাদের উপর ভর করেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই হয়তো নাট্যকার ঘন ঘন কবিতার সাহায্য নিয়েছেন। মনুষ্যজীবন তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে এবং অর্থহীন জীবনকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে আত্মবিশ্বাসের খুবই প্রয়োজন। আলোচ্য কবিতাগুলিই তার উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে যায়। নাট্যকার বাদল সরকার গদ্য ও কবিতার সংলাপের মিশ্রণ ঘটিয়ে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। এতে তাঁর কাব্যিক প্রকাশ যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি দিগন্ত জুড়ে জনপ্রিয়তাও ছড়িয়ে পড়েছে।

'সারারাত্তির' (১৯৬৩ খ্রি.) নাটকে নাট্যকার বৃদ্ধ চরিত্রটি দিয়ে একটি আত্মানুসন্ধান চালিয়েছেন। এই অনুসন্ধান বাইরের সঙ্গে ভিতরের; যা সারারাত ধরে চলতে থাকে। এই অনুসন্ধান 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-কেও ছাড়িয়ে যায়। তিনটি প্রতীকী চরিত্র (বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ) এবং ব্যঞ্জনা দিয়ে নাটকটিকে সাজানো হয়েছে। বৃদ্ধটি সারারাত ধরে জেগে থাকে। তাই তার চৈতন্যও চলাচল করতে থাকে। জাগ্রত এই চৈতন্য আমাদের জানা-অজানা, চেনা-অচেনা নানান প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। তখনই 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-র সব জিজ্ঞাসা 'সারারাত্তির'-এ গভীর ও গাঢ় হয়ে ওঠে। শুরু হয় বৃদ্ধের কবিতা—

"আমি জেগেছি। সারারাত্তির।
সারারাত্তির সারারাত্তির
সারারাত্তির জেগেছি দেখেছি
দুই চোখ মেলে জেগেছি দেখেছি
তন্দ্রাবিহীন দুই চোখ মেলে
সারারাত্তির জেগেছি দেখেছি জেনেছি।"[১৯]

সারারাত ধরে বৃদ্ধের জেগে থাকা এবং রাত্রে জেগে উঠে জানালার ধারে চিন্তা করা স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে আমরা পুরাতন প্রেমের সম্পর্কের ইঙ্গিত পাই। স্ত্রী রাত্রে জেগে থাকার কারণ জানতে চাইলে বৃদ্ধ কবিতার মাধ্যমে জানিয়ে স্পষ্ট করে দেয়।

"সা—রা—রা—ত্তি—র

সারারাত্তির প্রহরে প্রহরে
দণ্ডে দণ্ডে পলে অনুপলে
কতো অর্বুদ অণু পরমাণু
তিলে তিলে মিশে একটি রাত্রি বেঁধেছে।
.....
কতো মুহূর্ত মুহূর্তমালা গেঁথেছে।
....."[২০]

বৃদ্ধ এখানে নিছক বৃদ্ধ নয়; অভিজ্ঞতার কারণে বৃদ্ধ। এই বৃদ্ধের মধ্যে পুরোনো রঞ্জনের প্রেম জাগ্রত রয়েছে। তার প্রেমিকা এসেছে বলেই বৃদ্ধের থেকে পুরোনো রঞ্জন বেরিয়ে এসেছে। যে প্রেমকে পাওয়ার জন্য রঞ্জন রাতের পর রাত জেগে স্বপ্ন দেখেছে, তা এখন হাতের নাগালে। রঞ্জনের এই স্বপ্ন আজ যেন স্বীকৃতি পেল।

"....
আমার দু'চোখে শান দিয়ে দিয়ে
খোলা দুই চোখে নির্মম শাণ রেখেছি।
স্বপ্নের ভয়ে সজাগ প্রহরী
সারারাত্তির ধারালো দু'চোখে জেগেছি।
.....
প্রতি বার বার নির্বোধ মনে
তোমাকে স্বপ্ন তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি।"[২১]

স্ত্রী চরিত্রের কাছে রঞ্জন হলো মুক্তির পথ। এই জেগে থাকা রাত রঞ্জনের রাত। রাত পেরিয়ে সকাল হলেই রঞ্জন অদৃশ্য। স্ত্রী এই রাতকে ভুলতে চায় না। বৃদ্ধ কবিতার পঙক্তিতে জানায়—

"যা হবার হোক। সারারাত্তির
তবু তো দু'চোখ সারারাত্তির
মনের স্বপ্ন তবু তো দু'চোখ নেমেছে।
শেষ হয় হোক। তবু তো রাত্রি—
অসম্ভবের সম্ভাবনাকে জেনেছে।"[২২]

সমগ্র নাটকে বৃদ্ধ চরিত্রের আত্মানুসন্ধানের বিষয়টি বেশ চমকপ্রদ। প্রতি মুহূর্তে পাঠকমনে ভাবনার উদ্রেক ঘটায়। নাটকের নাম 'সারারাত্তির'। বিষয় হিসেবে সমগ্র একটি রাতের ঘটনা। ব্যবহৃত কবিতাগুলির প্রতি ছত্রে ছত্রে 'সারারাত্তির' কথাটি যুক্ত থাকায় আমরা কবিতার নামও 'সারারাত্তির' ভেবে নিতেই পারি। এবং নাটকে ব্যবহৃত স্তবকগুলিকে কবিতার অংশবিশেষ ধরে নিই। নাটকের ভিতর কাব্যিক সংলাপের ব্যবহারে নাট্যকারের অসীম দক্ষতার পরিচয় মেলে। আর দর্শক-পাঠক হিসেবে আমাদের চমক দেওয়ার পাশাপাশি আনন্দও এনে দিয়েছে। এখানেই নাট্যকারের সার্থকতা।

'যদি আর একবার' (১৯৬৬ খ্রি.) নাটকের প্রতিটি সংলাপেই কবিতার ছাঁচে ঢেলে নাট্যকর রচনা করেছেন। নাটকে উপস্থিত চরিত্রগুলি নিজেদের প্রয়োজনে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নাটকের গতিকে সচল রাখতে সাহায্য করেছে। তাদের মুখে বসানো সংলাপগুলি গঠনগত দিক দিয়ে কাব্যিক রূপ নিয়েছে।

"হয় নি, হয় নি বিয়ে, করেছি আমিই!
হওয়া তো অন্যের হাতে, নিয়তির মত।

আমিই করেছি বিয়ে বেছে বেছে দেখে শুনে
প্রেমে পড়ে গেছি ধরে নিয়ে। এ আমারই ভুল।
যা তার মাশুল—এতোদিন আমিই দিয়েছি,
আরো দিতে হবে বহুদিন।"[২৩]

নাটকে দুটি অঙ্ক রয়েছে। প্রথম অঙ্কে জীবনের অতৃপ্তির হতাশা। দ্বিতীয় অঙ্কে জীবনে সবকিছু পেয়ে দম বন্ধ হয়ে আসার আশঙ্কায় পূর্বের অতৃপ্ত জীবনে ফিরে আসার জন্য হতাশা প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ মানুষ সর্বদা অশান্তির মধ্যে বাস করছে। এর সমাধান একটাই। পূর্বের অবস্থায় জোর করে টিকে থাকা। বুড়ঢা জিনের মতো বছরে একবার সমুদ্র থেকে উঠে এসে অতৃপ্ত মানুষের মনে তৃপ্তির ছোঁয়া এনে দেয়। মানুষ তার স্বর্গসুখ খুঁজে পায়। এই স্বপ্নময় পরিবেশে সত্যসিন্ধু কবিতা আবৃত্তি করে—

"……
রাতের মানুষ নালিশ তোমার স্তব্ধ হোক
রাতের সাগরে ডুবুক তোমার ব্যর্থ শোক।
ভুলের মাশুল দিও না আর
শুরু করে দেখো আর একবার
……"[২৪]

এই কবিতা আবৃত্তির পর প্রত্যেকটি চরিত্র যেন নিজেদের জীবন ফিরে পায়। সবকিছু ভুলে গিয়ে তারা নতুন জীবন শুরু করে। শুধুমাত্র একটি কবিতার মধ্য দিয়ে মানব জীবনের হতাশা, অতৃপ্তি সরে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারে। বলা যায়, বাদল সরকার তাঁর ডায়রীর কবিতা দিয়ে যেমন নাটককে সমৃদ্ধ করেছেন, তেমনি নিজের কবিকুশলতারও পরিচয় দিয়েছেন।

'সার্কাস' (১৯৬৯ খ্রি.) নাটকে স্বাধীনতার সময়কালে হিন্দু-মুসলিমদের দাঙ্গা লাগিয়ে অজয় এবং তার বন্ধুদের মধ্যে হতাশা তৈরি করেছে। এই পরিস্থিতিতে মানুষ কর্মহীন থাকায় তাদের সার্কাসে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়। যারা যোগদান করবে, রাজনীতির যাঁতাকলে মাড়াই করে তাদের উপর শোষণ করা হবে। এমতাবস্থায় একজন ব্রতীন নামক যুবকের আগমন হয়। বন্ধু সরোজের মতে সে ভালো লেখালেখিও করে। ব্রতীন ভগবানের মতো তার প্রিয় মানুষকে বিশ্বাস করত। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই বিশ্বাস ভেঙে যায়। বিশ্বাসভঙ্গের সেই কবিতার নাম দিয়েছে 'চিরমানব'।

"জলন্ত-অঙ্গার-আত্মা ছদ্মভস্মমাখা
কুণ্ডলী ধোঁয়ায় ঢাকা রশ্মি-অঙ্গীকার
অমৃতের অধিকার নির্বিচারে দিয়েছো বিলিয়ে
কণ্ঠে বিষ নিয়ে।...."[২৫]

ব্রতীনের মধ্যে বিশ্বাসভঙ্গের কবিতা অর্থাৎ হতাশা যেমন দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি ভালোবাসার কবিতাও সমানভাবে রয়েছে।

"গলাটেপা নিঃঝুম এ ঘরে
ওপাশটা কোলাহলে আর্ত,
পাতা তো ঝরেই পড়ে, মুখ-বুজে ফুল খায় মার তো।
বসে-থাকা কড়ানীলে সাদা মেঘ কখন যে ভাসবে,
কবে তুমি আসবে?

.....
তবুও স্বপ্ন দেখি ফিরে এসে তুমি ভালোবাসবে,
কবে তুমি কবে কবে কবে তুমি আসবে?"[২৬]

শেষে ব্রতীনের ভালোবাসাই তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যেন পুরো পৃথিবী ব্রতীনকে রিজেক্ট করেছে। ব্রতীন বলেছে—

"সমস্ত পৃথিবী হেসে উঠে বললো—
তোমাকে বুঝলাম না।
.....
তবু বুঝবে না,
তবু হেসে উঠবে
সমস্ত পৃথিবী!।....."[২৭]

এরপর ব্রতীনের মধ্যে হতাশা যে চরম আকার নিয়েছে তা আমরা পরবর্তী সংলাপে প্রমাণ পেয়েছি। সে তার ভালোবাসাকে চুলোয় যেতে বলেছে এবং কবিতাকেও সারাজীবনের জন্য ছুটি দিয়েছে। এই ঘটনা বাদল সরকারের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। তিনিও একসময় ভালোবাসার জায়গা কবিতার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে কবিতাকে চিরবিদায় জানিয়েছেন। প্রবেশ করেছেন নাটকে।

বাদল সরকারের কাব্যিক প্রকাশকে ফুটিয়ে তুলতে হলে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' একাই যথেষ্ট। এই নাটকে নাট্যকার লেখক, ইন্দ্রজিৎ— চরিত্রের মধ্য দিয়ে বারবার কাব্যিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেই প্রকাশে তাঁর নিজস্ব জীবনের অর্থহীনতা, একঘেয়েমি, অস্তিত্ববাদের কথা বলে দর্শককে নতুন কিছু উপহার দেওয়ার প্রয়াস করেছেন। পরবর্তী 'সারারাত্তির' নাটকে নিঃসঙ্গ, একাকীত্ব নাট্যকারকে ঘিরে ধরলে তিনি আত্মানুসন্ধান চালিয়ে মুক্তির পথ অন্বেষণ করেন। এই সময়ে কবিতার উপর ভর করে যে কাব্যিক ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা অভূতপূর্ব। 'যদি আর একববার' নাটকে নাট্যকারের অতৃপ্তির হতাশা এবং সবকিছু পাওয়ার পরেও হতাশা একইভাবে রয়ে যায়। শুধুমাত্র সত্যসিন্ধুর একটি কবিতায় সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। নাট্যকারের এই কাব্যিক প্রকাশ নাটকে রিলিফ হিসেবেও কাজ করেছে। শেষে 'সার্কাস' নাটকে ব্রতীন চরিত্রের কাব্যিক প্রকাশের মাধ্যমে বিশ্বাসভঙ্গের হতাশা, প্রেম-ভালোবাসা ফুটে উঠেছে, যা আমরা বাদল সরকারের মধ্যেও লক্ষ করেছি।

পরিশেষে বলব, বাদল সরকার কবিতা লিখে খ্যাতি পাওয়ার জন্যে কবিতা রচনা করেননি। তাঁর কবিতার প্রতিটি চরণ আপন মনের মাধুরী মেশানো এলোমেলো কয়েকটি শব্দ দিয়ে তৈরি করা। এতে আছে শুধুই ভালোবাসা আর ভালোলাগা। তাঁর কবিতা নিয়ে কোনোদিন কাউকে কটাক্ষ করতে দেখিনি। কিন্তু তাঁকে আধুনিক কবিতায় ভয়ানক অবস্থার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে দেখেছি 'কবিকাহিনী' নাটকে। এই উচ্চ সাহসিকতার জন্যই বাদল সরকার অনন্য।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশঙ্কর। নাট্যতত্ত্ব-বিচার। করুণা প্রকাশনী, প্রথম করুণা সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৮৮।
২. তদেব, পৃ. ৮৯।
৩. সরকার, বাদল। নাটক সমগ্র (১ম খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, চতুর্থ মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২৪, কলকাতা, পৃ. ২৬২।
৪. তদেব, পৃ. ২৭১।

৫. তদেব, পৃ ২৭৬।
৬. তদেব, পৃ. ২৮২।
৭. তদেব, পৃ. ২৮৫।
৮. তদেব, পৃ. ২৮৫।
৯. তদেব, পৃ. ২৮৫।
১০. তদেব, পৃ. ২৮৯-২৯০।
১১. তদেব, পৃ. ২৯১।
১২. তদেব, পৃ. ২৯১।
১৩. তদেব, পৃ. ২৯৫-২৯৬।
১৪. তদেব, পৃ. ২৯৬।
১৫. তদেব, পৃ. ২৯৮।
১৬. তদেব, পৃ. ৩০০।
১৭. তদেব, পৃ. ৩০৪।
১৮. তদেব, পৃ. ৩১১-৩১২।
১৯. তদেব, পৃ. ৩২২।
২০. তদেব, পৃ. ৩৩৪।
২১. তদেব, পৃ. ৩৫০।
২২. তদেব, পৃ. ৩৫৬।
২৩. সরকার, বাদল। নাটক সমগ্র (২য় খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, চতুর্থ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২৭, কলকাতা, পৃ. ১৮৫।
২৪. তদেব, পৃ. ২০৭।
২৫. তদেব, পৃ. ৪৭৫।
২৬. তদেব, পৃ. ৪৭৭।
২৭. তদেব, পৃ. ৪৭৮।